



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 133 - 138

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সুবোধ ঘোষের ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পে মাতৃসত্তার করুন পরিণতি

ড. আনন্দ ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জি. এল. চৌধুরী কলেজ, অসম

Email: ananda.glc@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Parshuram,
Dhaniya, tragic,
orphanage,
breastfeeding,
profession,
prostitute,
motherhood.

Abstract

The extraordinary thematic diversity of Subodh Ghosh's 'Parashuramer Kuthar' seems to be a natural artistic acknowledgment of real-life education. The story describes a tragic tale where a lactating mother is murdered by the axe of societal norms and pushed into the ranks of branded prostitutes. In a patriarchal society, we are all Parashurams who kill our mothers. Perhaps society itself is illuminated in the form of the rough axe-murder of an innovative, mother-killing Parashuram. The main character of the story is Dhaniya, a young rural woman. She does not live a healthy, normal life; her primary identity is as Tilak's mother. However, no one knows the identity of Tilak's father. In a strange way, Dhaniya gives birth to one child after another every year in the free beds of the Missionary Zenana Hospital, sends them to the Missionary orphanage, and returns to her 'Chagal Lodge'. In reality, her profession was to raise other people's children by breastfeeding them. Thus, motherhood was her profession, and her body was her commodity. But problems arose in the post-war years. Many new competitors arrived from across the sea—various foreign foods. Hence, today Dhaniya is not called to household homes. Today she is ostracized by society. When the middle class needed Dhaniya, there was no fault in her visiting homes. But today, she is not needed. Therefore, there is an objection even if she comes on festive days—she is now considered a 'randi' (prostitute) in the eyes of society.

When Dhaniya, who once gave new life to children by breastfeeding them, is wounded and battered by their lustful axes, she herself takes the initiative to punish herself. At the end of the story, we see Dhaniya having to go and stand in the prostitute quarter, having her name registered in the prostitutes' ledger. She, an innocent mother, is forced to become an object of uncontrolled sexual desire for the very children of respectable families whom she once nourished with her breast milk. This helpless, peculiar mother, in her

faded youth, was forced to become a victim of lust by her own 'children'. This is the tragic consequence of motherhood.

Discussion

ভূমিকা : বাংলা ছোটগল্প রচনায় সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। তাঁর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি চমকপ্রদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন তার প্রচণ্ড যান্ত্রিক অগ্রগতি নিয়ে ভীষণ নরমেধের যজ্ঞে মেতে উঠেছে, তখনই সুবোধ ঘোষের আত্মপ্রকাশ। কল্লোল, কালি কলম ও প্রগতি যুগের সৃষ্টিনিরীক্ষার মরশুমী অজস্রতার অবসানের পর যেমন বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ তারারশঙ্করের ‘জলসাঘর’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ ও ‘পদ্মানদীর মাঝি’ নবযুগসৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ ১৯৪০ সালে সুবোধ ঘোষের ‘অযান্ত্রিক’, ‘ফসিল’ এবং ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নব প্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা করে দিল। বিশেষ করে তার রচিত ‘সুন্দরম’ ‘পরশুরামের কুঠার’ ও ‘তিন অধ্যায়’ এই তিনটি গল্পে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্বে গর্বিত মানুষের সুকর্ষিত সৌন্দর্যানুভূতি, সমাজরক্ষী নীতিচেতনা ও উপন্যাসিক আভিজাত্যবোধের ভিত্তিমূল পর্যন্ত বৃহত্তর জীবন চৈতন্যের আলোকে পরীক্ষিত হয়েছে। ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পে স্তন্যপায়ীযুগদায়িনী জননীকে সমাজের অনুশাসনকুঠারে হত্যা করে তাকে মার্কামারা বারবনিতার দলে ঠেলে দেওয়ার মর্মান্তিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন পুরুষশাসিত সমাজের এক বর্বরতায় ও গণতন্ত্রের উপযোগবাদী কঠোর মানসিকতায় মাতৃহত্যা চরম অপমৃত্যু। পুরুষ শাসিত সমাজে আমরা সকলেই মাতৃ হত্যাকারী এক পরশুরাম। হয়তোবা সমাজটাই মাতৃহত্যাকারী অভিনব এক পরশুরামের রক্ষ কুঠার রুদ্ধ মূর্তিতে উদ্ভাসিত। সুবোধ ঘোষ এখানে পৌরাণিক নামের আশ্রয়ে তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন এবং মাতৃহত্যা করণ পরিণতি ফুটিয়ে তুলেছেন।

আলোচনা পত্রটিতে সুবোধ ঘোষের ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে, কিভাবে একটি মাতৃসত্তার চরম অবনতি ঘটলো তা আলোচনা করার প্রয়াস করব। আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে মুখ্য উৎস হিসেবে ‘সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প’ গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন সমালোচনা মূলক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে বর্ণনাত্মক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

আলোচনা : সুবোধ ঘোষের ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পটি এই নামেরই একটি গল্প সংকলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৪২ সাল। এই গ্রন্থের প্রকাশের দু’বছর পরে বের হয় ‘ফসিল’ গল্প সংকলন। দুটি গ্রন্থই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে প্রকাশিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকাল মানেই যেমন দেশীয় রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এক চরম অগ্নিপরীক্ষার কাল, তেমনি সাহিত্য সংস্কৃতির সূত্রে একাল সমস্ত রকম লেখক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে নতুন এক বাস্তবতার স্বরূপ তুলে ধরার চিহ্নিত অধ্যায়। সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাবাদের পথ ধরে মধ্যবিত্তের নতুন এক বাস্তবালয়ের মধ্যে তাঁর পাঠকদের আকৃষ্ট করেছেন। এই বাস্তববোধ লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা থেকে জাত নিশ্চিত নতুন মাত্রার জীবন পর্যবেক্ষণ। ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পে তার প্রমাণ মেলে। এই গল্পটি সম্বন্ধে সাহিত্য সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন –

“ ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পের অসাধারণ বিষয়বৈচিত্র্য সেইসব রূঢ় বাস্তব জীবন শিক্ষার অন্যতম এক স্বাভাবিক শিল্প-স্বীকৃতি। ক্রমশ নতুন করে গড়ে-ওঠা একখানি শহরের নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসর্বস্ব জীবনধারণ ও যাপনের উজ্জ্বল চিত্রকে বুঝিবা পোস্টমট্টেমের টেবিলে রেখে সর্বকালের মানব্য-ভাবনার তীব্র আলো ফেলে গ্লোমের ছুরি দিয়ে নিপুন জীবন-ব্যবচ্ছেদ করেছেন গল্পকার।”^১

‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পের প্লট-নিবিষ্ট খণ্ড খন্ড কাহিনী ও ঘটনা ধীরে ধীরে গল্পের কাঠামোকে একটি পূর্ণ রূপ দেয়। কোলিয়ারিগুলিকে ঘিরে যে অঞ্চলের নাম ছিল সামান্য ‘নয়াবাদ বাজার’, তা ক্রমশ নতুন কুলি, কারিগর, কেরানি, দোকানীদের ভিড়ে একটি থানার অধীন থেকে হয়ে ওঠে ‘নয়াবাদ মহকুমা’। একজন সার্বভিভিশনাল অফিসারের আদালত,

কিছু উকিল, ডাক্তার, একজন ওভারসিয়ার শ্রেণীর ভদ্রলোক - এদের আবির্ভাব, প্রাইমারি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা, মিউনিসিপালিটি চালু হওয়া, ক্যাথলিক মিশনের গির্জা নির্মাণ, দেশি খুস্টান মেয়েদের কনভেন্ট, একটি অনাথালয়, একটি জেনানা হাসপাতাল, বাউবনের মধ্যে নতুন সব ইমারতের মাথা তুলে দাঁড়ানো নয়াবাদ স্টেশন - এই সমস্ত দিয়ে নতুন গড়ে ওঠা ছোট শহরটা হয় কসমোপলিটান স্বভাবের। এই শহরেরই বাঙালিটোলা থেকে সামান্য দূরে দুর্গা বাড়ির পিছনে এক আমড়াতলায় গল্পের প্রধান চরিত্র ধনিয়া নামে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়ের ঘর। ঘরের সামনে একটি ছাগল সবসময় বাঁধা থাকে বলে বাংলা স্কুলের ছেলেরা নাম দেয় 'ছাগল লজ'। এরই গায়ে গায়ে আছে দীর্ঘদিন জেল খাটা আশি বছরের বুড়ো প্রসাদী দোসাদের আস্তানা। গল্পটিতে আমরা দেখি এই প্রসাদী ধনিয়ার দেওয়া অল্পেই জীবন নির্বাহ করে।

এই গল্পটিতে আমরা দেখি তিলকের মা ধনিয়া।

“তিলককে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। তিলকের বাবাকে, তাও কেউ জানে না। কিন্তু দু-তিন বছর পর পর নিয়মিত ক্রমে তিলকের অনুযোগ ও অনুজরা ভূমিষ্ঠ হয়।”^২

ধনিয়া দু-তিন বছর পর পর নিয়মিতভাবে সন্তানের জন্ম দিয়ে আসে মিশনারী জেনানা হাসপাতালের একটি ফ্রি বেডে।

“ক্ষুদ্র বিবর্ণ একটি মানুষের শাবক কঁকড়ে পড়ে আছে ধনিয়ার বুকের কাছে। কটা দিন যেন উষ্ণ নরম ডানার তলায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। শ্লথ শরীরটা একটু ভরাট হয়ে আসে, চামড়ার ভাঁজ আর রেখাগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। মিটমিট করে তাকায় হাত-পা ছোঁড়ে। একটু স্পর্শ পেলেই চারা গাছের পাতার মতো লোলুপ ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে।”^৩

তারপর ধনিয়া ছেলে ওখানেই ফেলে চলে আসে। তার ছেলে না-নেওয়ার যুক্তি - তার ছেলেকে খাইয়ে পড়িয়ে বাঁচিয়ে রাখার মতো অর্থাত্তাব, তার উপর তার ছেলে তার কাছে থেকে ভিখারি হবে, দুশমন হবে - এসব সে চায় না। বরং নার্সদের কেউ তার ছেলেকে রাখলে সে আন্তরিকভাবেই তার আয়া হতে রাজি। তার ছেলেগুলি এভাবেই ক্রমশ সোজা নার্সারিতে চালান হয়ে যায় হাসপাতাল থেকেই।

“তারপর আর নয়। পাখি উড়ে যায়। ধনিয়া একা ফিরে আসে তার 'ছাগল লজে'। তিলকের ভাইটিও যথা নিয়মে মিশন অনাথালয়ে চালান হয়।”^৪

রাতে ধনিয়া একাধিক পুরুষের সঙ্গে কাটায় বলে তার ছেলেদের বাবার নাম নার্স রেজিস্টারকে জানাতে অক্ষম, একথা সে অপপটে স্বীকার করে।

বস্তুত রাতের অন্ধকারে প্রতিরাতে রাউন্ডের পুলিশের আয় বাড়িয়ে নতুন শহরের মানুষরা ধনিয়ার কুঁড়েঘরে ভিড় জমায়। এমন যে ধনিয়া, তাকে একসময় খুব দরকার পড়ে নয়াবাদের ভদ্র বাড়ির প্রসূতিদের জন্য। প্রসূতিদের আদি-ব্যাদি-জর্জর সুতিকা রোগ, রক্তহীনতা, বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে এবং কোন ঔষধ নয় সদ্যোজাত বাচ্চাদের মায়ের বুকের দুধের ভাইটালিটির প্রয়োজনে ধনিয়া নিজের বুকের দুধ দিয়ে বেড়ায় তাদের সন্তানদের মুখে। কারণ 'সন্তানবতী বধুসমাজ ও এহেন ধনিয়ার সাহায্যের উপর নির্ভর না করে আর পারলো না। তাদের মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাটুকু নইলে বুঝি মাঠে মারা যায়।’^৫ তাই বংশ রক্ষার তাগিদে বা সংকটে মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ ডেকে আনে ধনিয়াকে। আমড়াতলা থেকে একেবারে ভদ্রবাড়ির আতুর ও অন্তঃপুরে। তাইতো ধনিয়ার ডাক পরে বাড়ি বাড়ি। বুকের দুধ খাইয়ে যাবার ঠিকে। ধনিয়া এর বদলে পায় দু'বেলার রোট নগদ মাসিক ছ'টাকা, দৈনিক এক পো চালের সিঁধে আর ঠিকে শেষ হলে বিদায় নেবার দিন একটা শাড়ি। এই বরাদ্দে ধনিয়া বাড়ি বাড়ি খেটে যায় প্রতিদিন সকাল বা সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত। ধনিয়ার হাতের ভাঁজ-করা তোয়ালে, সুগন্ধ তেল মাখানো মাথার বাধা চুল, লাল সায়ার ওপর পাতলা ধোলাই শাড়ি, চলার সময় পায়ের চুটকি গুলোর খই ফোটান মত শব্দ, মুখের মৃদু হাসি, প্রসাধনের থেকে পরিচ্ছন্নতা, সুশ্রী চেহারা - এসবই তার যেমন বড় রকমের আকর্ষণ, তেমনই ভদ্রবাড়ির গৃহিণীদের রসাল জটলার বিষয়ও। তাইতো ঘোষালবাবুর স্ত্রী বিদ্রোহিণী বলে -

“যাক্ মুখের ওপর কিছু বলিস নি ঝি। দায়ে পড়েছি কাজ নিতে হবে। ভেতরে যে যেমন লোক হোক না আমাদের কি?”^৬

‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পটিতে আমরা ধনিয়ার মধ্যে দেখতে পাই মাতৃসত্তার এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি। সে ঘোষাল বাবুদের বাড়ির অন্দরে ঢুকে যায়। কারণ এখানে একবেলা ঠিকে খাটতে হবে। মাত্র তিন মাসের একটি ছেলে রয়েছে এই বাড়িতে। ঘোষাল বাবুর স্ত্রী জীর্ণ-শীর্ণ অসুস্থ। অন্যদিকে নরেন বাবুর বাড়িতেও ধনিয়ার ডাক পড়ে, কারণ একটা খাড়ি ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হবে। তিন বছর বয়সের রোগাপটকা ছেলে, পেটে এখনো গরুর দুধ হজম হয়না। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কাঁদে আর মাটিতে গড়ায়। কোন প্রবোধ সাঙ্কনা মানে না। কিন্তু ধনিয়া বারান্দায় উঠে হাতে তালি দিয়ে সেই শিশুকে শান্ত করায়। লেখকের ভাষায়-‘চিৎকাররত ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত বোতল শয্যা থেকে একবার ফণা তুলে তাকালো, তারপর এক দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধনিয়ার কোলে।’^{১৭} বহু পরিচর্যাকারিণী সেবাপরায়ণা এই নারী, দু-তিন বছরের নিয়মিত ব্যবধানে হাসপাতালে এক একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে মাতৃসন্তনের উৎস অব্যাহত রাখে। কারণ সন্ত্যপাণ করিয়ে সে জীবন বাঁচাবে অন্য শিশুদের। দেহে মনে সে শুধু জননী। পথে অনাথ শিশুদের শোভাযাত্রা দেখে ওদের মধ্যে নিজের অনামিক সন্তানের কল্পনায় প্রিয় সংঘ সুখের চরম ক্ষণে উৎসারিত সজলাসাবের মত এক পুলকের বন্যা তার সমস্ত শরীর উপচে ওঠে, উৎসারিত মাতৃধারায় বুকের কাচুলি যায় ভিজ়ে। তবু নিজের যথার্থ সন্তানের প্রতিপালন দায়িত্ব গ্রহণ করতে সে প্রস্তুত নয়। তার অসামাজিক জীবন সম্বন্ধে সে সচেতন, সন্তান বড় হয়ে তার দুশমন হবে, তা সে সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া তার ঘরে মানুষ হওয়া মানেই তো ভিখারির সংখ্যা বাড়ান। তার চেয়ে শিশুরা নার্সারিতে প্রতিপালিত হলে মানুষও হবে আর বিশেষ পরিচয়ের কলঙ্ক মুক্ত হয়ে নির্বিশেষে অপরিচয়ে হবে শুধু মানব সন্তান। এভাবেই বছরের পর বছর কেটে যায় ধনিয়ার।

ধনিয়ার আমড়াতলার জীবনে কোনো ছেদ পড়েনি। এখন ধনিয়ার চল্লিশ বছর বয়স। এর তিন বছর আগে শুধু শেষবার জেনানা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল ধনিয়াকে। ভদ্র সমাজে ধনিয়ার আনাগোনা ঘুচে গেছে অনেকদিন। কারন বিলিতি গুঁড়ো দুধের আমদানি হওয়ায় ধনিয়ার ভদ্র বাড়ির শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর আর প্রয়োজন নেই।

“সাগর পাড় থেকে ধনিয়ার বহু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে-হরেক রকমের বিলেতি ফুড। এঁড়ে লাগা নবজাতকদের ধুকপুকে আয়ু ভিজিয়ে রাখতে ধনিয়ার আর ডাক পড়ে না। তাকে বোধ হয় সকলেই ভুলেই গেছে।”^{১৮}

তাই ধনিয়ার এখন অভাব পয়সার। তেলভাজার দোকান করে উপার্জনের চেষ্টা করে, চেহারায় তার জৌলুসের অভাব ঠিকই, কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য এখনও অটুট আছে বলে এখনো ধনিয়া হঠাৎ হঠাৎ কোন কোন লোককে রাতে ঘরে ঢুকতে দেয়। ধনিয়া এর মধ্যে বড়দিনের পরবে আগের চেনা বাবুদের বাড়ি কিছু বকশিশের মতো ভিক্ষে করতে যায়। কারণ- ‘একদিন তো চাকরি করেছি। পরবীর দাবি করা যেতে পারে। যদি খুশি মনে দেয়- দশ টাকাও যদি ওঠে।’^{১৯} কিন্তু বিফল হলো ধনিয়া। নরেন বাবুর বাড়ির অন্দরে ঢুকতে পেল না সে। ঘোষাল বাবু চার আনা দিলেন। আর ধীরেন বাবুর বাড়ির দেউড়িতে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ঝি এসে মাত্র একটা টাকা হাতে দিল। আর ঘরে ঘরে ঝি ও গিল্লীদের এক আপত্তির কলরব শোনা গেল -

“আবার এতদিন পরে উদয় হলো কোথা থেকে? পাড়া ভরা সব আইবুড়ো ছেলে। ম্যাগী যে কখন কার সর্বনাশ করে বসে কে জানে। ... পাড়া ঘেঁসে এসব জীব থাকা উচিত নয়। ওরা থাকলেই যত গুন্ডা বদমাশের উপদ্রব ডেকে আনে।”^{২০}

গল্পটির পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখি ধনিয়ার এক করুণ পরিনিতির ছবি। পাড়ায় কথা ওঠে - ধনিয়ার মত গণিকাকে ভদ্র পাড়া থেকে সরিয়ে তাদের নির্দিষ্ট পল্লীতে পাঠাতে হবে। সকলেই এই প্রস্তাবে অনুমোদন জানালো - ‘দুর্গাবাড়ীর কাছাকাছিই আমড়াতলার ও নোংরামি এবার সরিয়ে দেওয়াই উচিত।’ বড়দিনের ছুটিতে ধনিয়া রাস্তায় শোভা যাত্রার মধ্যে ব্যান্ড বাজিয়ে যাওয়া অনাথালয়ের ছেলেদের দেখে গভীর মাতৃত্বের গোপন মমতায় সজল অনামনস্ক হয়। তখনও সে জানে না তাকে গণিকাপল্লীতে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সমাজ তাকে আর চায় না। তাইতো -

“মিউনিসিপাল কমিশনারের বৈঠক। কোতোয়ালী অফিসারের কাছে জরুরী নোট পাঠানো হলো। শহরের নানা ভদ্রপল্লীতে কতগুলি নষ্টচরিত্র ছোট জাতের মেয়ে প্রচ্ছন্নভাবে কুৎসিত ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের যেন সেগ্রিগেট করে বাজারের লাইনে বসিয়ে দেওয়া হয়।”^{১১}

অনেক চেষ্টা করেও পুলিশকে টাকা দিয়েও ধনিয়া শেষপর্যন্ত তাকে সেই পল্লীতে পাঠানোর ব্যবস্থা বন্ধ করতে পারল না। শেষে কান্নাকুল হয়ে ধনিয়া দুদিন ধরে অভুক্ত বুড়ো প্রসাদী দোসাদকে বুকের দুধ নিঃশেষ করে খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে মুক্ত হয়। ধনিয়া চলে আসে গণিকাপল্লীর আলো ঝলমল নির্দিষ্ট দোতলা ঘরে। নতুন করে সারা শরীরে উদ্দাম উত্তাল কামের আগুন জেলে, পানের পিকে ঠোট লাল করে, দুহাত তুলে জানালার ওপর কনুই রেখে সামনে বুক স্থির হয়ে দাঁড়ালো ধনিয়া। ওর সর্বাপেক্ষা ছাপিয়ে তখন এক বিদ্যুৎ অস্থির আনন্দের জ্বালা। তার এমন প্রতীক্ষা মাঝরাত, শেষ রাত পর্যন্ত। কারণ নিচে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরই বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হওয়া সেই ঘোষাল বাবুর লক্কী চেহারার বড় ছেলে, আছে খাজাঞ্চি বাবুর ছেলেদের ইঙ্গিতময় ইশারা। চল্লিশ বছরের মধ্যবয়সী মা ধনিয়া মাতৃসত্ত্বা থেকে সে চিরকালের বিদায় নেয় এক শিশুর মত বৃদ্ধ প্রসাদীর প্রতি মাতৃত্বের শেষ পরিচর্যা করে। এই পরিচর্যা আপাত বিকাশ থাকতে পারে কিন্তু অসহায় মাতৃ অনুভব সক্রিয়।

ধনিয়ার সর্বজনীন মাতৃসত্ত্বা তার যেমন জীবিকা সত্তার সমর্থক, তেমনি তার মানবিক সত্তার ও পোষক। তার একান্ত নিজস্ব মাতৃসত্ত্বার প্রকাশ দু'ভাবে গল্পে ধরা পড়ে। তার বুকের দুধ দিয়ে যে জীবিকা, সেখানে তার মাতৃসত্ত্বা স্মৃতি সূত্রে এক কৌতুকের অনুভব জাগায়। সেখানে সে নিজের বুকের দুধ বিলিয়ে কৃত্রিম স্নেহজাগরণের মজা পায় -

“ধনিয়া বলে- এ ঝি দিদি, তোমাদের বড় ছেলে কই? ঝি কিছুক্ষণ সন্দ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে থেকে বলল- ওই যে তাস খেলছে। তা, এত খোঁজে দরকার কি তোমার? - উঃ কত বড় হয়ে গেছে। দাঁত ওঠার পর মাই ছাড়তে পারিনি। একবার কামড়ে দিয়ে আমাকে কি নাকাল করেছিল, মনে আছে তো ঝি।”^{১২}

এখানে কৃত্রিম পেশাগত মাতৃ সম্পর্কে ধনিয়ার এক হালকা মজা আছে। কিন্তু অনাখালয়ের ছেলেদের মার্চ করে ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে উৎসবের আয়োজনে অংশগ্রহণের চিত্রে ধনিয়া এক অন্য-মা -

“ধনিয়ার চোখের দৃষ্টি তখন অদৃশ্য চুম্বকের মত প্রত্যেকটি ছেলের মুখের উপর ছোঁ মেরে ফিরছে। এরমধ্যে ছ’টি তারই উপহার। কিন্তু কে তারা চেনবার উপায় নেই। ...কিসের ভাবে যেন দাঁড়িয়ে ছিল ধনিয়া। জনতা কখন সরে গেছে।... দূর বনের মাথায় কুয়াশা গেছে গলে।”^{১৩}

আজ সমাজ তাকে গণিকাপল্লীতে পাঠিয়ে নাম দিয়েছে ‘রাভী’ - ‘আমার জাত নেই, আমি নাকি রাভী’। তাইতো সমাজের প্রতি ধনিয়ার অভিযোগ-‘গাই গরুরও স্বামী নেই, তারা কি লছমি নয়?’

গল্পে ধনিয়ার যে বিষাদময় পরিণতির চিত্র, তার মাতৃসত্ত্বার সম্পূর্ণ অবলম্বনেই মেলে। তার যে পতনের ছবি, তা পতন নয়, সর্বশেষ দধীচির মত মৃত্যুবান হয়ে তথাকথিত নীতিনিষ্ঠ, স্বার্থপর সভ্যতা, সমাজ ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ। তার প্রশ্নে যেসব পুরুষ বড় হয়েছে, জীবন পেয়েছে, তাদের সমূলে ধ্বংস করার অব্যর্থ মৃত্যুবাণ সে। এই গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

“সুবোধ ঘোষের প্রত্যেক গল্পের উপরই অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয় - ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানব মনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবন সংকটের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখা চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।”^{১৪}

উপসংহার : ‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পের ধনিয়া একালের গল্পকারের কলমে যেন এক চিরকালের শিল্পীর নিষ্ঠুর প্রশ্ন। ধনিয়া চরিত্রের মাতৃসত্ত্বায় আছে লক্ষণীয় বৈপরীত্য। সে নিজের সন্তানকে কাছে রাখে না, অন্যদের সন্তানকে মাতৃত্ব দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। মাতৃত্ব বিক্রয় তার জীবিকা, মাতৃত্ব তার পেশা। দেহ তার পণ্য নয়, মাতৃত্ব নামক মূল্যবান সম্পদ সঞ্চয় ও আহরণের প্রধান উপায়। তাই ধনিয়াকে সাধারণ দেহোপজীবিনীর স্তরে রাখা যায় না। সে একাধিক অপরিচিত বা সদ্য পরিচিত পুরুষকে দেহ দান করে ঠিকই, কিন্তু তার বিনিময়ে সে অর্থ জমায়ে না, বরং মানবতা বোধকে বুকের গভীরে লালন করে

উষ্ণ স্বভাবে। এখানেই সে সাধারণ গণিকা নয়। ধনিয়ার সর্বজনীন মাতৃসত্তা তার যেমন জীবিকা সত্তার সমর্থক, তেমনি তার মানবিকসত্তারও পোষক। তার একান্ত নিজস্ব মাতৃসত্তার প্রকাশ দু'ভাবে গল্পে ধরা পড়ে। তার বুকের দুধ নিয়ে যে জীবিকা, সেখানে তার মাতৃসত্তা স্মৃতিসূত্রে এক কৌতুকের অনুভব জাগায়। সেখানে নিজের বুকের দুধ বিলিয়ে কৃত্রিম স্নেহ জাগরণের মজা পায়। কিন্তু অনাথালয়ের ছেলেদের মার্চ করে ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে উৎসবের আয়োজনে অংশগ্রহণের চিত্রে ধনিয়া এক অন্য মা - এ চিত্র হল সত্যিকারের ব্যাক্তি মা ধনিয়া - যার গভীর সত্তায় আপনার বিশুদ্ধ আলোর মত দুটিময় হয়ে আছে বিশ্ব মায়ের অন্তর। কিন্তু গল্পের শেষে আমরা দেখি খাতায় নাম লিখিয়ে ধনিয়াকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় বারবনিতা পল্লীতে। ভদ্র ঘরের যেসব সন্তানদের নিজের বুকের স্তন্যে সে একদিন বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদেরই অসংযত যৌন কামনার সামগ্রী হতে হয় তাকে। এ যেন মাতৃসত্তার করুণ পরিণতি।

Reference:

১. দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, ৭ম মুদ্রণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯. ২০১৪, পৃ. ৩৫
২. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পা), সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, ১৪২৪, পৃ. ৬২
৩. তদেব, পৃ. ৬২
৪. তদেব, পৃ. ৬২
৫. তদেব, পৃ. ৬৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৪
৭. তদেব, পৃ. ৬৪
৮. তদেব, পৃ. ৬৭
৯. তদেব, পৃ. ৬৭
১০. তদেব, পৃ. ৬৭
১১. তদেব, পৃ. ৬৯
১২. তদেব, পৃ. ৬৭
১৩. তদেব, পৃ. ৬৮
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, নবম সংস্করণ, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লি, কলকাতা-৭৩, ১৯৯২, পৃ. ৬৪৬